সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 28 | No. 2 | 1985

Check for updates

আবুল মনসুর আহমদের রাজনৈতিক ব্যঙ্গরচনা

Volume	28
Issue	2
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রাজীব হুমায়ুন
Published online	February 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v28i2.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i2.10
Pages	1-23
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

আবুল মনসুর আহমদের রাজনৈতিক ব্যঙ্গরচনা

রাজীব হুমায়ুন

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮–১৯৭৯) একাধারে রাজনীতি, ওকালতি, সাংবাদিকতা ও সাহিত্যসেবা করেছেন। তাঁর চারটি পরিচয়ের মধ্যে সাহিত্যিক পরিচয় সবচাইতে বড় ব'লে বিভিন্ন মহলে স্বীকৃত। আর সাহিত্যিক পরিচয়ের মধ্যে ব্যঙ্গ রচনার স্রষ্টা হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত।

আবুল মনসুর আহমদ উপন্যাস, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গরচনা, ধর্মভিত্তিক গ্রন্থাবলী এবং শিশু–কিশোরোপযোগী গ্রন্থসমূহ মিলে বিশখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আঠারোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অপ্রকাশিত গ্রন্থদুটো হচ্ছে 'মা–খাকী' (উপন্যাস) ও 'তিতুমীর'। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে End of a Betrayal and restoration of Lahore Resolution (১৯৭৪) ইংরেজী ভাষায় লিখিত। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'আয়না' (১৯৩৫), 'ফুডকনফারেন্স' (১৯৪৪), 'গালিভরের সফরনামা' (১৯৫৬) ও 'আসমানী পর্দা' (১৯৫৭) ব্যঙ্গ–রচনার সমষ্টি ; 'সত্যমিথ্যা' (১৯৫৩), 'জীবনক্ষুধা' (১৯৫৬) ও 'আবেহায়াত' (১৯৬৯) উপন্যাস ; 'পাকবাঙলার কালচার' (বাঙলাদেশের কালচার—১৯৬৬), 'শেরেবাঙলা হইতে বঙ্গবন্ধু' (১৯৭৩) এবং 'বেশী দামে কেনা কমদামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা' (১৯৮২) প্রবন্ধ সংকলন, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (১৯৬৮) ও 'আত্মকথা' (১৯৭৮) স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ ; 'মুসলমানী কথা' (১৯২৪), 'নয়া পড়া' (১৯৩৪) ও 'ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া' (১৯৫২) শিশু–কিশোরোপযোগী গ্রন্থ ; আলকোরআনের নসিহত (১৯৭৫) অনুবাদগ্রন্থ। এ'ছাড়া রয়েছে যৌনবিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ 'পরিবার পরিকল্পনা'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আবুল হাসনাত সাহেবের নামে প্রচলিত প্রখ্যাত যৌনবিজ্ঞান গ্রন্থের অনেকটা আবুল মনসুর আহমদের রচনা।[১] বলাবাহুল্য, উপন্যাস, ব্যঙ্গরচনার সংকলন, প্রবন্ধসংকলন ও স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থসমূহ

ছাড়া বাকীগুলো ঠিক সাহিত্যপদবাচ্য নয়। মূলতঃ সমাজসচেতন ব্যঙ্গ-রচনার স্রষ্টা হিসেবে তিনি বাঙলা সাহিত্যে অতুলনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর প্রবন্ধসমূহ মৌলিকচিন্তার পরিচয়বাহী।

আবুল মনসুর আহমদের রচনাসমূহ বিশেষ ক'রে ব্যঙ্গরচনাবলী ব্যাপক-ভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হবার দাবী রাখে। উনিশ শ' বিশের দশকে খ্যাতি লাভ করলেও আজ পর্যন্ত আবুল মনসুর আহমদের ওপর কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাঁর কথাসাহিত্য নিয়ে অতি-সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, নুরুল আমিনের আলোচনা গ্রন্থ 'আবুল মনসুর আহমদের কথাসাহিত্য' (১৯৮৪)। এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৬০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ডক্টর অজিতকুমার ঘোষের গবেষণামূলক গ্রন্থ "বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা"। এ গ্রন্থে চর্যাপদ থেকে শুরু ক'রে পঞ্চাশের দশকের অনেক লেখক আলোচিত হলেও আবুল মনসুর আহমদ আলোচিত হননি। বাঙলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গস্রষ্টার প্রতি অবহেলার মূলে অজ্ঞতা না অন্যকিছু কাজ করেছে তা' বলা কঠিন।

'আয়না' 'ফুডকনফারেন্স', 'গালিভরের সফরনামা' ও 'আসমানীপর্দা' গ্রন্থের অধিকাংশ রচনাই ব্যঙ্গগল্প; বাকীগুলো ব্যঙ্গনাটিকা ও প্যারডি-স্যাটায়ার। ব্যঙ্গগল্প, নাটিকা, ও প্যারডি-স্যাটায়ার মিলে চারটি গ্রন্থে ৩৭টি ব্যঙ্গরচনা রয়েছে। তাঁর প্রথম প্যারডি-স্যাটায়ার 'ছহি বড় তৈয়ব-নামা' প্রকাশিত হয়েছিল আবুল কালাম শামসুদ্দীন সম্পাদিত 'মুসলিম জগতে'। 'ছহি বড় তৈয়বনামা' মশহুর পুঁথি 'ছহি বড় সোনাভানে'র অনুকরণে লিখিত হয়েছিল। লেখকের রাজনৈতিক সহকর্মী খেলাফত-নেতা মৌলবী তৈয়ব-উদ্দীন আহমদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজদলের একজন আইন-পরিষদ সদস্য ছিলেন। মৌলবী তৈয়ব স্যার আবদুল করিম গজনবীর অনুরোধে সরকার পক্ষে একটি ভোট দিয়ে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছিলেন। তাঁর এই কাজের নিন্দায় লেখক ঐ প্যারডি-স্ট্যাটায়ারটি লিখেছিলেন।[২] প্রথম রচনাটি কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

চারটি গ্রন্থে সঙ্কলিত ব্যঙ্গরচনাসমূহ ১৯২২ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে লিখিত এবং 'সওগাত' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। এদের মধ্যে

'ট্যাঙ্গশের গান গাই' (আসমানী পর্দা) প্যারডিটি ১৯৬৫ সালে রচিত হয়েছিল। আসমানী পর্দার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। সুতরাং প্যারডিটি নিশ্চয় পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যঙ্গরচনা সংকলনেরই একাধিক সংস্করণ রয়েছে। 'আয়নার' সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে। কোন গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ রচনাসমূহের জনপ্রিয়তা এবং সার্থকতার অন্যতম মাপকাঠি। বলাবাহুল্য, রচনাসমূহ পত্রিকায় প্রকাশের সাথে সাথে পাঠককুলের প্রশংসা-ধন্য হয়। 'ফুডকনফারেন্স' প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন—'আয়না' লিখিয়া আবুল মনসুর আহমদ প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছিলেন। ফুডকনফারেন্স লিখিয়া তিনি অমর হইলেন।[3] 'আয়নার ফ্রেম' বেঁধেছিলেন নজরুল ইসলাম এবং 'ফুডকনফারেন্স' উদ্বোধন করেছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। 'আয়নার ফ্রেম' বাঁধতে গিয়ে অর্থাৎ মুখবন্ধ রচনা করতে গিয়ে নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন 'যে-সমস্ত মানুষ হরেক রকমের মুখোশ প'রে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপমূর্তি বন্যভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। মানুষের মুখোশ-পরা এই বহুরূপী বনমানুষগুলোর সবাইকে মন্দিরে, মসজিদে, বক্তৃতার মঞ্চে, পলিটিক্সের আখড়ায়, সাহিত্য সমাজে বেশ বহুবার দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে।[4] বলাবাহুল্য, আয়নার ফ্রেমটি বড় মজবুত হয়েছিল। ফ্রেমটি এখনও অটুট রয়েছে। ভেতরের 'আয়নার' বিলকুল মরচে পড়েনি এবং মুখগুলো আগের মতই রয়েছে। ফুডকনফারেন্স উদ্বোধন করতে গিয়ে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছিলেন 'আবুল মনসুরের আয়নার মুখ দেখে যাঁরা খুশী হয়েছেন, 'ফুডকনফারেন্সে'ও নিশ্চয় তাঁরা পেটভরে খেয়ে প্রচুর আনন্দ পাবেন।'[5]

'আয়না' উৎসর্গিত হয়েছিল আবুল কালাম শামসুদ্দীনের করকমলে। উৎসর্গ-পত্রে লেখক 'হাসির পেছনে কান্না লুকানো আছে'[6] বলে দাবী করেছেন। 'ফুডকনফারেন্স' উৎসর্গিত হয়েছিল ফজলুল হক খাঁকে। উৎসর্গ-পত্রে বক্তব্য ছিল "দুনিয়ার ফুডকনফারেন্সে ভিজিটার্স গ্যালারিতেই তোমার আমার বরাবরের পরিচয়। ভিজিটার্স গ্যালারী থেকে সটকে তুমি ডেলিগেটস এনক্লোজারে ঢুকে না পড়, তারই জন্য তোমার গলায় ভিজিটার্স টিকিটের এই মালা ঝুলিয়ে দিলাম।"[7] গালিভারের সফরনামা 'ব্রেইন অপারেশনের উস্তাদ'[8]

জর্জ বার্নার্ড শ স্মরণে উৎসর্গিত। উৎসর্গ-পত্রের বক্তব্যসমূহ বিশেষ করে শেষোক্ত গ্রন্থের নামকরণ প্রণিধানযোগ্য।

১৯২২ থেকে ১৯৫৪ কাল পরিধিতে অর্থাৎ বত্রিশ বছরে রচিত সাঁই-ত্রিশটি ব্যঙ্গরচনার মধ্যে গল্পের সংখ্যা আটাশ। বাকী নয়টির মধ্যে চারটি নাট্যচিত্র, তিনটি প্যারডি-স্যাটায়ার এবং বাকী দুটো নতুনরীতিতে রচিত ব্যঙ্গরচনা। কয়েকটি রচনায় রূপকের আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন 'অথ কুত্তাশিয়াল চরিতামৃত', 'ফুডকনফারেন্স', 'গোদেওত্তা কাদেশ' ইত্যাদি। কমপক্ষে দুটো গল্প স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ রয়েছে। গল্প দুটো হচ্চে 'গোদেওত্তা কাদেশ' ও 'ধর্মরাজ্য'। তিনটি প্যারডির মধ্যে দুটো—'ট্যাক্সের গান গাই' ও 'আয় ভেয়ে কে যাবি আয়' যথাক্রমে নজরুল ইসলামের 'মরী' ও 'আয় বেহেস্তে কে যাবি আয়' অবলম্বনে রচিত। তৃতীয় প্যারডি 'ছহি বড় ওয়ারতনামা', 'ছহি বড় সোনাভানে'র অনুকরণে রচিত। শেষোক্ত লেখাটি প্যারডি-স্যাটায়ার পর্যায়ের। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মক-হিরোইকের মতো প্রথমে মনে হতে পারে। তবে লেখাটি ঠিক সে-পর্যায়ে পড়েনা।

১৯২২ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশের রাজনীতি, ধর্ম এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে বহু আন্দোলন ও বহু ঘটনা ঘটেছে। ব্যাপকঅর্থে রাজনীতি ক্ষেত্রে চলছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন; ধর্মীয় ক্ষেত্রে চলছিল একদিকে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ, অন্যদিকে একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় কলহ; অর্থনীতি ক্ষেত্রে চলছিল ধনিক-জমিদারদের শোষণ, দুর্ভিক্ষ, পন্যাভাব ইত্যাদি। সাধারণ জনগণ ঘটনা বা আন্দোলনের উপরি-ভাগ দেখেন আর একজন সচেতন নাগরিক অথবা একজন ব্যঙ্গকার দেখেন উপরিভাগের নীচের ঘটনা, অন্তরালের ঘটনা। রাজনীতিক-সাংবা-দিক-উকিল আবুল মনসুর আহমদ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, অন্তরালের ঘটনাসমূহকে তাঁর বিষয়বস্তু করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি দেখেছিলেন হিন্দু-মুসলিম নেতৃত্বে কোন্দল- অনৈক্য-চক্রান্ত। 'অথ কুত্তা-শিয়াল চরিতামৃত' 'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি', 'ত্রিযুগনিতি' 'ছহি বড় ওয়ারত নামা' প্রভৃতি ব্যঙ্গরচনায় তিনি তাদের এঁকেছেন। তিনি দেখেছিলেন তথাকথিত বিদ্রোহীদের; দেশসেবার নামে তথাকথিত দেশ-সেবকদের অপচেষ্টা, নির্বাচন প্রহসন; দেখেছিলেন গদির প্রতি লোভ;

ইংরেজ-প্রীতি, ইংরেজ-প্রদত্ত খেতাবের মোহ এবং স্বার্থান্বেষী মূর্খ রাজনীতিকদের। এদেশের রাজনীতির অঙ্গনে এরা সবাই চেনামুখ। সেই চেনামুখদের সাহিত্যের পাতায় এনে ব্যঙ্গের চাবুক হেনেছেন 'বিদ্রোহী সঙ্ঘ', 'জনসেবা ইউনিভার্সিটি', 'এ, আই, সি, সি', 'জমিদারি উচ্ছেদ', 'আহা যদি প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম', 'চেঞ্জ অব হার্ট', 'বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে', 'ইলেকশন', 'অনারেবল মিনিষ্টার', 'ফুডকনফারেন্স', 'মডার্ণ ইবরাহিম', 'গালিভরের সফরনামা' প্রভৃতি ব্যঙ্গরচনায়। ধর্মের ক্ষেত্রে লেখক দেখেছিলেন ধর্মের নামে বিবিধ গোঁড়ামি—হিন্দু-মুসলিম বিবাদ, একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় খুঁটিনাটি নিয়ে দ্বিমত ও কলহ, রক্ষণশীলতা, ধর্ম-ব্যবসা, ভণ্ডপীরদের কীর্তিকলাপ। 'গো দেওতো কা দেশ', 'ধর্মরাজ্য', 'নায়েবে নবী' 'লীডরে কওম', 'মুজাহেদীন', 'আসমানীপর্দা', 'শিক্ষাসংস্কার', 'খাজাবাবা' ও 'হুজুর কেবলা', রচনায় তাদের সাক্ষাৎ মেলে। '২২ থেকে '৫৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময় ঘটেছে দুর্ভিক্ষ, বিভিন্ন পণ্যাভাব। এ দুর্ভিক্ষ এবং পণ্যাভাবের পেছনে দায়ী ছিল বিবিধ রাজনৈতিক এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিস্বার্থ ও কারসাজি। শুধু খাদ্যের দুর্ভিক্ষ নয়, চলছিল চেতনার ও মূল্যবোধের দুর্ভিক্ষ। সেই চেতনার দুর্ভিক্ষের নিপুণ-চিত্র 'ফুডকনফারেন্স', 'গ্রোমোর ফুড', 'লঙ্গরখানা', 'সায়েন্টিফিক বিজিনেস', 'রিলিফওয়ার্ক', 'মিছিল' প্রভৃতি রচনা। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে অথবা আক্রমণ ক'রে তিনি কোন ব্যঙ্গরচনা লেখেননি এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। ফলে তাঁর রচনায় ল্যাম্পুন, ইনভেকটিভ অথবা কুৎসা-কাহিনীর ঠাঁই নেই। পৃথিবীর ব্যঙ্গসাহিত্যে এটি প্রায় দুর্লভ বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগতভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হ'য়ে সাহিত্যে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা তিনি করেননি। আবুল মনসুর আহমদ অঙ্কিত প্রায় প্রতিটি চরিত্র তাদের নিজস্ব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। তাঁর একটি মাত্র চরিত্র কোন নির্দিষ্ট সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করেনা বলা যায়। সেই ব্যতিক্রমী চরিত্রটি হল ব্যর্থ অথচ সকলের প্রিয় 'আদুভাই'। 'আদুভাই' রসরচনার পর্যায়ে পড়ে। ব্যঙ্গ-সাহিত্যের বৈচিত্র্য বিচার ক'রে সাধারণতঃ রাজনৈতিক ব্যঙ্গ, নৈতিকব্যঙ্গ, সাহিত্যিক ব্যঙ্গ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। উপরের আলোচনা থেকে অনায়াসে বোঝা যায়, আবুল মনসুর আহমদে সাহিত্যিক ব্যঙ্গ নেই বললে চলে। জোনাথন সুইফটের 'গালিভার্স ট্রাভেলস'-এর চতুর্থ পর্বকে

নৈতিক ব্যঙ্গের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়। পুরোপুরি এ জাতীয় ব্যঙ্গ আবুল মনসুর সৃষ্টি করেননি। আলোচনার ভিত্তিতে আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গ রচনাকে ব্যাপকঅর্থে তিনভাগে ভাগ করা চলে—১ রাজনৈতিক ব্যঙ্গ, ২ অর্থনৈতিক ব্যঙ্গ, ও ৩ ধর্মীয় ব্যঙ্গ।

রাজনৈতিক ব্যঙ্গ

(ক) ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বশর্ত ছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে লীগ-কংগ্রেস মৈত্রী (১৯১৬), পরবর্তীকালে লীগ ও কংগ্রেসের মিলিতভাবে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যানে (১৯১৮), ১৯২০ এর খেলাফত আন্দোলনে, ১৯২১ এর অসহযোগ আন্দোলনে ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বেঙ্গলপ্যাক্ট হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু গোড়া থেকেই বিভিন্ন আন্দোলন প্রচেষ্টায় ফাটল ধরানোর কাজে নিয়োজিত ছিল ইংরেজদের বহুখ্যাত divide and rule policy। বলা হয়ে থাকে, ইংরেজদের ভেদনীতি শুরু হয়েছিল আসলে ১৮৭০ এর পর থেকে। বিভিন্ন সময় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মাত্র। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গে মুসলমানদের উপকার করা ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল না—উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টি ক'রে নিজেদের শাসন-শোষণের পথ অবারিত করা—বিপ্লবী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্থ করা। ফলে দেখা গেছে, ১৯০৫-১৯০৬ সালের বিপ্লবী বাহিনী গঠিত হয়েছিল মূলতঃ হিন্দু মধ্যবিত্ত থেকে। বস্তুতঃ, তৎকালে বিপ্লবীরা মুসলিম বিরোধী ছিলেন। কেননা, হিন্দুরা দেখেছিলেন বৃটিশেরা মুসলমানদের, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন। আর মুসলমানরাও সরকারের দাবার চালে জড়িয়ে পড়েছিলেন।[৭] অন্যদিকে "ভারতীয় বুর্জোয়ার চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য তারা ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরী ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল ছিলো। এই নির্ভরশীলতার ফলেই অগ্রসর হিন্দু-বুর্জোয়া এবং অনগ্রসর মুসলিম বুর্জোয়া উভয়েই অল্পবিস্তর ইংরেজ-বিরোধী হলেও সেই বিরোধিতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা সর্বাত্মক বিপ্লবী চরিত্র পরিগ্রহ করতে পারেনি। উপরন্তু হিন্দু-মুসলমান বুর্জোয়ার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার জন্মদান ক'রে পরিস্থিতিকে আরও অনেক বেশী জটিল ক'রে

তুলেছিলো ... এই বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা গেলো সেটাও ইংরেজদের সহযোগিতায় ক্রমশঃ দানা বাঁধতে থাকলো''।[১০] অবশেষে মুসলমানরা ব্যস্ত হলো দ্বিজাতিতত্ত্ব নিয়ে আর হিন্দুরা ব্যস্ত হল এক জাতি তত্ত্ব 'অখণ্ড ভারত' নিয়ে। ইংরেজদের কাজ ছিল অদূরে ব'সে মুচকি হেসে ইন্ধন যোগানো। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর কয়েকটি রচনায় যুগপৎ ভেদনীতির ইন্ধনদাতা এবং তাদের শিকার হিন্দু-মুসলমানদের ব্যঙ্গ করেছেন।

প্রথমেই আলোচনা করা যাক, 'গালিভরের সফর নামা' গ্রন্থের 'অথ কুত্তাশিয়াল চরিতামৃত' নাট্যচিত্রটি। সুন্দরবনের রাজা রয়েল বেঙ্গল টাইগার গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে অবগত হলেন—তাঁর সাম্রাজ্যের কুত্তা ও শিয়াল সম্প্রদায় স্বাধীনতা চাচ্ছে। তিনি চিন্তিত। জানা গেল, কুত্তা ও শিয়াল সম্প্রদায় বহুযুগের বিরোধ কলহ ভুলে ঐক্যবদ্ধ। ''অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী করিয়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজতন্ত্রের 'অবসান ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না করিলে সার্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া এবং এই সমস্ত দাবী-দাওয়া রাজার নিকট পেশ করিবার জন্য শক্তিশালী প্রতিনিধিদল গঠন করিয়া সবশেষে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন প্রস্তাবাদি মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হইল ... রাজ-তন্ত্রের অবসানের আর বিলম্ব নাই, পর্যবেক্ষক মহলের নিকট তা' স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল।''[১১] অন্যদিকে সুন্দরবন রাজের গোপন মন্ত্রণাকক্ষে বানরের পরামর্শে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল কুত্তা ও শিয়াল সম্প্রদায়কে পৃথক-ভাবে রাজ দরবারে নিমন্ত্রণের। নিমন্ত্রিত কুত্তাদের জানানো হল, তারাই দেশ-শাসনের উপযুক্ত—তবে কুণ্ডলীকৃত বাঁকা লেজে তাদের ত্রুটি রয়েছে। ত্রুটি সংশোধন করতে চাইলে 'গাভিন শিয়ালনী ও সদ্য বিয়ান বাচচাশিয়ালের চর্বি'[১২] ব্যবহার করতে হবে। কুত্তারা খুশী হয়ে চলে গেল। সেইদিন সন্ধেবেলা শিয়ালরা এলে কুত্তাদের লেজের প্রশংসা করা হল এবং দৌড়াবার কালে শিয়ালদের লম্বা লেজের ত্রুটির কথা বলা হল। শেষে কুণ্ডলীকৃত করবার সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত হবার জন্য উপদেশ দেয়া হল। এবং তা করতে হলে ''কুত্তার সদ্যজাত শাবকের চর্বি নিজ-নিজ লেজে মাখিবে এবং সূর্যোদয়ের

প্রথম কিরণে চন্দন কাঠের ধুয়ায় শেঁক দিবে।''[১৩] সেই থেকে কুত্তারা লেজ সোজা করবার এবং শিয়ালেরা লেজ কুণ্ডলী করবার সাধনা করছে। আন্দোলন বন্ধ আছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনে নির্বিবাদে রাজত্ব করছে।[১৪]

'অথ কুত্তাশিয়াল চরিতামৃত' একটি রূপক নাট্যচিত্র—Beast-Fable কাহিনী ধারায় নির্মিত। রয়েল বেঙ্গল টাইগার নিঃসন্দেহে বিদেশী ইংরেজ এবং কুত্তাশিয়ালের মাধ্যমে স্বাধীনতা-সংগ্রামরত হিন্দু-মুসলমানের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি থেকে ইংরেজ এবং হিন্দু-মুসলমানদের চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়না। যেমন সুন্দরবন রাজকে "কেহ কেহ দেশে গ্রাজুয়েল রিয়েলিযেশন অব-সেল্ফ-গবর্ণমেণ্টের আশ্বাস দিয়া নেতৃবৃন্দের সাথে আক্ষেপ করিবার পরামর্শ দিলেন।''[১৫] তাছাড়া অন্যত্র ব্যবহৃত 'স্বরাজস্বাধীনতা', 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন', 'রাজার শাসন মানবনা', 'সার্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলন' ইত্যাকার শব্দসমষ্টি তৎকালীন রাজনৈতিক অঙ্গনের পরিবেশ নির্মাণ করে। পটভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে ভেদনীতির কথা উত্থাপিত হয়েছিল। নাট্যচিত্রের একটি চরিত্র শিবুপণ্ডিত এক জায়গায় বলে ''আমরা ধর্মসাক্ষী করিয়া সারমেয় সম্প্রদায়ের সহিত প্যাক্ট করিয়াছি। আপনার এই ভেদনীতি, ডিভাইড এণ্ড রুল, আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরাইতে পারিবেনা।''[১৬] শিবুপণ্ডিতের 'প্যাক্ট' এবং 'ডিভাইড এণ্ড রুল'—লক্ষ্ণৌ-প্যাক্ট, বেঙ্গল-প্যাক্ট এবং ইংরেজদের ভেদনীতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

নাট্যচিত্রের বহুস্থানে ভেদনীতির শিকার হিন্দু-মুসলমানের ওপর ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত। এক কুত্তা একবার বাঘকে বলেছিল—''হে আমাদের পরম হিতৈষী রাজা বাহাদুর, আপনি আদেশ করুন, আমাদের কোন্ সামান্য ত্রুটির দরুণ শিবাসম্প্রদায় আমাদের হাত হ'তে দেশের নেতৃত্ব কাড়িয়া লইতে পারে'' ?[১৭] অন্যদিকে শিবা বলেছিল ''তাহা হইলে হে পরম ভক্তিভাজন মাতুল ঠাকুর, আমরা এখন কি করিব' ?[১৮] বাঘের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে গিয়ে কুত্তা এবং শিয়ালেরা বাঘেরই অনুগ্রহ প্রার্থী হল এবং নিজেদের নিয়োজিত করল পরস্পরের নিধন যজ্ঞে। আন্দোলন এখন কোন্ অবস্থায় আছে? আন্দোলন বন্ধ আছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনে নির্বিবাদে রাজত্ব করছে। নাট্যচিত্রটি রচিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের পাঁচ বছর আগে

অর্থাৎ ১৯৪২ সালে। মাওলানা আযাদ বলেছিলেন, বৃটিশেরা মুসলিমদের হাতের ক্রীড়নক বানিয়েছিল। আসলে বৃটিশেরা খেলাচ্ছিলেন দু'পক্ষকেই। আত্মঘাতী আনাড়ী খেলোয়াড়দের নিপুণ ব্যঙ্গচিত্র 'অথ কুত্তাশিয়াল চরিতামৃত।

স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃবৃন্দের আত্মকলহ ও বিচ্ছিন্ন সংগ্রামের রূপক প্যারডি-স্যাটায়ার 'ছহি বড় ওযারতনামা' (১৯৪৩)। রচনাটি প্রচলিত পুঁথি 'ছহি বড় সোনাভানে'র প্যারডি। ওযারত বিবি যৌবনপ্রাপ্ত হলে তাকে লাভ করবার জন্য চারভাই ফজু-নযু, রামা-শামা সিদ্ধান্ত নিল। চারভাই, মা বঙ্গবানুকে বোঝাল ওযারত বিবি এলে ঘরে সুখসমৃদ্ধি আসবে। 'বসিবে সোনার পাটে, শুইবে রূপার খাটে পোলাও খাইবে দিনরাত'।[১৯] কিন্তু কে আগে তাকে জয় করতে যাবে তা নিয়ে লড়াই শুরু হল। 'আম্মা কান্দে এ কেমন বিবাদ ঘরোয়া'।[২০] অবশেষে আপোষ সিদ্ধান্ত অনুসারে যথাক্রমে ফজু-নযু-রামা-শামা ওযারত বিবিকে জয় করতে গিয়ে বিবির হাতে বন্দী ও নাজেহাল হল। বঙ্গবানুর ক্লেশ গেলনা।

প্যারডি-পুঁথির ওযারত বিবিকে যুক্ত বাংলার মন্ত্রীত্ব হিসেবে ধরা যেতে পারে। একদিকে ফজু-নযু মুসলমানদের অন্যদিকে রামা-শামা হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করছে। বঙ্গবানু বাঙলা এবং বাঙলার জনগণ। নযু-ফজু-রামা-শামা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করলে ওযারত বিবিকে লাভ করতে পারত। কিন্তু অনৈক্যের কারণে শুধু যে তারা মন্ত্রীত্ব/ক্ষমতা লাভে ব্যর্থ হল তা নয়, ক্ষমতার অধিকারীর হাতে বন্দী হয়ে তারা ভেঁ ভেঁ করছে—বাঙলার জনগণের দুঃখ গেলনা। মন্ত্রীত্ব/ক্ষমতা লাভ সব ভাইয়েরই প্রয়োজন ছিল অথচ তারা বিভেদ করল বয়সে বড় ছোট নিয়ে, আগে-পরের ব্যাপার নিয়ে।

> ফজু বলে এ 'বড় অন্যায়
> আমি বড় সবাকার আমি আগে হকদার
> মুই আগে ভজিব কন্যায়।'

ভায়ে-ভায়ে লড়াইয়ে লাভ হল কি ?

> ফযু মিয়ার লুংগি গেল নজুর পায়জামা।
> রামা—শামার গামছা গেল নাহিক গায় জামা।।
> তবু না লড়াই থামে কান্দে বেপরোয়া।
> আম্মা কান্দে এ কেমন 'বিবাদ ঘরোয়া।।[২১]

বন্দী হয়ে চার ভাই কি করছে? প্রত্যেকে আলাদাভাবে বিবির মুচকি হাসির প্রতীক্ষায় রয়েছে। বন্দীত্বের পরও একাকী মন্ত্রীত্ব লাভের খায়েশ তাদের গেলনা।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এ চার যুগের শেষ তিনযুগকে নিয়ে রচিত হয়েছে রূপক ব্যঙ্গনাটিকা 'ত্রিযুগমিতি'। লেখক নাটিকা না বলে বলেছেন নাটীকা অর্থাৎ টীকা নয়। নাটীকাটি অনেকটা 'অথ কুভাশিয়াল চরিতামৃতে'র মতই। ত্রেতাযুগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল মদনাডাকাত এবং করিমচোরার ঐক্যের। কেননা ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে তারা 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার'[২২] লাভ করতে পারবে, 'স্বরাজ স্থাপন'[২৩] করতে পারবে। দ্বাপর যুগে ডাকাতদের আলাদা সংগ্রাম চলল। কলি যুগে শুরু হল চোর এবং ডাকাতদের অন্তর্বিবাদ। বিবাদের এক পর্যায়ে ডাকাতরা উভয়ের শত্রু কাযীর সাথে আপোষের কথা ব'লে চোরদের ধমকাল। চোরেরা প্রত্যুত্তরে জানাল তারা আগেই আপোষ ক'রে ফেলেছে এবং আপোষের অন্যতম শর্ত ছিল পরস্পরকে কাযীর কাছে ধরিয়ে দেওয়া। নিজেদের চক্রান্তে এবং বিশ্বাসঘাতকতায় উভয়দলই কাযীর হাতে ধরা পড়ল। কাযী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন "আর এমন অল্প পরিশ্রমে সমস্ত চোর ডাকাতদের একত্রে গ্রেফতার করিতে পারিলাম যে-ভ্রাতৃ-বিরোধের দৌলতে, সে ভ্রাতৃ-বিরোধ জিন্দাবাদ।"[২৪] রূপক-নাটিকার আগাগোড়াই হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য ও রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃ-বিরোধকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। মদনাডাকাত মুসলিমলীগ, করিমচোরা হিন্দু আর কাযী ইংরেজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ব্যঙ্গের নিপুণ ব্যবহারে আগাগোড়া নাটিকাটি জমে উঠেছে:

> এই যে দুই-দুইটা যুগধরিয়া চৌর্যবৃত্তির স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলাম, তাতে চোরেরা আমাদের সহ-সভাপতি ছাড়া আর উচ্চতর কোন সম্মান দিয়াছে? জাতীয় পতাকা বলিয়া ওরা যে-নিশান চালাইয়া দিয়াছে, তাতে শুধু খন্তিমার্কা দেওয়া হইয়াছে কেন? আমাদের ডাকাতদের সঙ্গে খন্তির কি সম্পর্ক আছে।[২৫]

প্রথম অংশে কংগ্রেস এবং হিন্দুদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে ব'লে ধারণা করা যেতে পারে। এক সময় কংগ্রেসে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানানো হতো

কিন্তু সাধারণতঃ কম ক্ষমতাসম্পন্ন সহ-সভাপতির পদ ছাড়া বড় কোন পদে নিয়োগ করা হতোনা। উদ্ধৃতির দ্বিতীয়াংশে 'বন্দে মাতরমকে' ব্যঙ্গ করা হয়েছে ব'লে ধারণা করা যেতে পারে। 'বন্দেমাতরম'কে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত করবার চেষ্টা চলছিল। অথচ 'বন্দেমাতরমে'র বাণীতে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ঠাঁই ছিলনা।

'ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি' (১৯৪৫) গল্পে অনৈক্যের বিষয়টি এসেছে ভিন্নভাবে। হিন্দু—মুসলমান একতাবদ্ধ না হলে ইংরেজরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবেনা-এ'কথা লেখক ভাল করেই জানেন আর জানেন বলেই লেখকের মনে হয়েছে গান্ধী-জিন্নাহ্ যেন ইচ্ছে করেই অনৈক্যের খেলা খেলছেন যাতে ইংরেজরা স্বাধীনতা গছিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে। ''সম্মিলনীতে গিয়ে আপনি আর আমি মারামারি বাঁধাব। আমাদের টানাটানি ক'রে ছাড়াতেই বড় লাটের প্রাণান্ত হবে। স্বাধীনতা দেবার ফুরসত পাবে সে কোথায়!''২৬ এ' গল্পে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেন উল্টোদিকে ফিরে। হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ফলে স্বাধীনতার আসল প্রশ্নটিই চাপা পড়ে যাচ্ছিল বারবার—যেমন বাইরের সমস্যার চাপে অনেক সময় আসল সমস্যাই চাপা পড়ে যায়। এ'গল্পে লেখকের ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হল তাদের পর যারা বুঝেও বুঝাতে পারেনা অথবা বুঝাতে চায়না অনেক কিছু। নিজেদের মধ্যে অনৈক্য থাকলে স্বাধীনতা আসবেনা——এ' সহজ সত্যটি গান্ধী-জিন্নাহর না বুঝবার কথা ছিলনা। সুতরাং এ সহজ সত্যটি উপলব্ধি করবার পরেও যদি কেউ আত্মকলহে লিপ্ত থাকে তাহলে সে আত্মকলহকে ইচ্ছাকৃত ছাড়া আর কীইবা বলা যায়?

(খ) তথাকথিত বিদ্রোহী-সমাজে এক শ্রেণীর বিদ্রোহী আছে যাদের বিদ্রোহ পলায়নবাদের নামান্তর। রাজনৈতিক বিদ্রোহে ঝুঁকি আছে ব'লে তারা সামাজিক আচার-অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বুলি কপচিয়ে সমাজে দাম ও নাম বাড়াবার চেষ্টা করে। অথচ সেটা যে অধিকাংশ সময়, গা বাঁচাবার ফন্দীমাত্র——মুখোশ একটু উন্মোচন করলেই সহজে বোঝা যায়। তাছাড়া, একশ্রেণীর বিদ্রোহী আছে, যাদের স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। যারা ভাবে বা ভাবত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এলে কোন প্রচলিত নিয়মকানুন মানতে হবেনা——এমনকি ট্রাম ট্রেনের ভাড়া পর্যন্ত দিতে হবেনা। আবার

কিছু কিছু ব্যক্তি আছে, যারা দেশের প্রতি ভালবাসায় নয়, শুধু ব্যক্তিস্বার্থে আঘাত লাগবার কারণেই বিদ্রোহীদের দলে নাম লেখাতে চায় এবং ব্যক্তি-স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পারলে পরের দিনই দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। এ'জাতীয় বিদ্রোহীদের পরিচয় পাওয়া যায় 'বিদ্রোহীসঙ্ঘ' গল্পে। আগা-গোড়া উদ্ভট কৌতুক উপাদানে ভরা গল্প 'বিদ্রোহী সঙ্ঘ'; চাকরীলাভে ব্যর্থ হয়ে একজন ব্যক্তি রাতারাতি প্রচণ্ড বিদ্রোহী হয়ে গেল এবং সত্যিকার বিদ্রোহীদের খোঁজে ঘুরে অবশেষে ঢাকার বিদ্রোহীসঙ্ঘের সন্ধান পেল। বিদ্রোহীসঙ্ঘে কিছুদিন ঘোরাফেরা ক'রে সে হতাশ হল। কারণ, বিদ্রোহী-সঙ্ঘের বিদ্রোহ ছিল প্রচলিত নিয়মকানুনের উল্টোটা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাদের কাছে গান গাওয়া মানে বেসুরো চীৎকার, স্বাধীনতা মানে কোন আইন না মানা ইত্যাদি। তাদের বিদ্রোহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়; কেননা, ইংরেজরা হাত-পা বাঁধলেও আত্মা বাঁধেনি। বিশ্বমানবতা তাদের আদর্শ—সে অর্থে ইংরেজ তাদের পর নয়। এ'ধরনের বিদ্রোহীসঙ্ঘের সন্ধানদাতার ওপর নব্যবিদ্রোহী খুব চটেছিল। হঠাৎ সন্ধানদাতার দেখা পেয়ে জানতে পারল, সন্ধানদাতা আসলে সি. আই. ডি.র লোক এবং সেও তার হতাশার কথা ব্যক্ত করল, আসল বিদ্রোহীদের খুঁজে না পাওয়ার কারণে। অন্যদিকে তথাকথিত বিদ্রোহী সঙ্ঘের সদস্যরা নব্যবিদ্রাহীর আচরণে সন্দিগ্ধ হল এবং ইংরেজদের কাছে লিখে পাঠাল ইংরেজ-তাড়ানো তাদের উদ্দেশ্য নয়। ঘটনাচক্রে সে চিঠি পৌঁছাবার আগে সঙ্ঘের দিকে পুলিশদের আসতে দেখা গেল। যথারীতি নেতাসহ সকলে অভিনব কায়দায় সেখান থেকে পালাল।

গল্পটি উত্তমপুরুষে কথিত। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিদ্রোহের নমুনা পাওয়া যাবে। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড যার মনে ইংরেজ-বিদ্বেষ জাগাতে পারেনি, ব্যক্তিস্বার্থে আঘাত লাগবার সাথে সাথেই সে বিদ্রোহী হয়ে গেল। ''আমার ভিতরে ইংরেজ-বিদ্বেষের বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল সেইদিন—পুনঃ পুনঃ চাকুরীর ভরসা দিয়াও যেদিন জেম্‌স সাহেব আমাকে তাহার অফিসগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য তাঁহার আর-দালিকে হুকুম দিয়া বসিলেন।''[২৭] যথেচ্ছাচারের জন্য যাদের কাছে স্বরাজের আবশ্যকতা, তাদেরও ব্যঙ্গ করা হয়েছে এ' গল্পে। ''ইহার উপর বিনা

টিকেটে ট্রামে চড়ার অপরাধে যেদিন গোরা চেকার আমাকে একটাকা জরিমানা লাগাইল, সেইদিন আমার মধ্যে বিদ্রোহের রক্ত টগবগ করিয়া উঠিল। স্বরাজের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ থাকিলনা।"[২৮] গোপনে রাজভক্তি প্রদর্শনকারী তথাকথিত সামাজিক সংস্কারের ধ্বজাধারীদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে এ'ভাবে—"আর ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেবের কাছে এখনই এ'মর্মে দুখানি পত্র লিখে দাও যে, বিশ্বমানবতাই আমাদের আদর্শ, সোশিয়াল রিফর্মই আমাদের কর্মপদ্ধতি, আর রাজভক্তি প্রচারই আমাদের জীবনের ব্রত, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য আমরা প্রাণ দিতে পারি। আরো' লিখে দাও যে, আমাদের সভাপতির মামাত ভাই গত মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ দিয়েছেন'[২৯]।

(গ) দেশ সেবার নামে আত্মসেবা ও রাজনৈতিক ভণ্ডামি—"The earliest modern political groups in South Asia can be characterized more as interest groups than as political parties."[৩০] দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি প্রসঙ্গে এ' বক্তব্যের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ নেই। রাজনৈতিক আদর্শের চাইতে অধিকাংশ দলের দলীয় কর্মীদের ব্যক্তিস্বার্থ অনেক বড়। এবং এ' ব্যক্তিস্বার্থ হাসেলের জন্য চলতে থাকে গলাবাজী, ধাপ্পা, ভণ্ডামি। চলতে থাকে ধাপ্পার মাধ্যমে ক্ষমতা লাভের অন্তহীন প্রচেষ্টা; নিজে নেতা হবার জন্য নতুন নতুন দল-সমিতি গঠন। কিন্তু মুখে চলতে থাকে অনর্গল দেশপ্রেমের বুলি। দেশপ্রেমের বুলি আওড়াবার সহজতম পন্থা বক্তৃতা। কাজের চাইতে নেতাদের ঝোঁক বেশী বক্তৃতার প্রতি এবং অধিকাংশ বক্তৃতা প্রতারণামূলক। বক্তৃতাবাজি প্রসঙ্গে ওয়েসারের পর্যবেক্ষণ সুন্দর। প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় দিবস, কোন নেতার জন্ম-মৃত্যুদিবস, সুযোগ পেলেই রাজনীতিবিদেরা বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। তাছাড়া, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, কোন বিদ্যালয়ের পাকাভবনের উদ্বোধন, গভীর নলকূপ বসানো—জাতিগঠনমূলক এ'সব কর্মকাণ্ডও নেতাদের গলাবাজির মোক্ষম সুযোগ এনে দেয়।[৩১] সব কিছুর মূলে ক্রিয়াশীল একমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ। অধিকাংশ রাজনীতিকেরা শুধু ভণ্ড বা প্রতারকই নয়, অশিক্ষিতও বটে। আবুল মনসুর আহমদের 'জনসেবা ইউনিভার্সিটি', 'এ, আই, সি, সি,' 'জমিদারি উচ্ছেদ', 'আহা যদি প্রধানমন্ত্রী হতাম', 'রাজনৈতিক

বাল্যশিক্ষা' এবং 'রাজনৈতিক ব্যাকরণ' রচনাসমূহে এ-জাতীয় রাজনীতিবিদদের সাক্ষাৎ মেলে।

'জনসেবা ইউনিভার্সিটি'র ইয়াকুব যখন নিজের জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হল, তখন জনসেবা করেই জীবন কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আত্মসেবা করতে হ'লে যেমন ডিগ্রীর প্রয়োজন, জনসেবা করতে হলেও তেমনি ডিগ্রীর প্রয়োজন ব'লে সে জনসেবা ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডক্টরেট ডিগ্রীর প্রচেষ্টায় নামল। সে প্রথমে জনসেবার ইনফ্যান্ট ক্লাশ অর্থাৎ জনসেবার সামাজিক দায়িত্ব পেল। তারপর জনসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রাইমারী পাশ করল অর্থাৎ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হল. তারপর ক্রমান্বয়ে সেকেন্ডারী, ইন্টারমিডিয়েট. বি. এ., এম. এ. এবং ডক্টরেট লাভ করল অর্থাৎ যথাক্রমে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, আইন সভার সদস্য, মন্ত্রী, লাট এবং খানবাহাদুর / সার/লর্ড হল। এর সবগুলিই সে হয়েছিল জনগণকে আশার পর আশা দিয়ে; 'আশার ছলনে ভুলি' জনগণ তাকে যথাসাধ্য সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়েছিল। কিন্তু, অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছিল কি? নিশ্চয়ই। "চেহারাও খুব খানিকটা বদলাল বটে, কিন্তু দেশের নয়, জনসাধারণেরও নয়—ইয়াকুবের নিজের। শেরওয়ানী পাজামা ফেলে, দাড়ি-মোচ কেটে কোট-প্যান্টলুন পরে ইয়াকুব মিয়া ইয়াকুব সাহেব হল"।[৩২] এবং সে সাথে শুধু খেতাবী লাট বাহাদুর ও অসার সার নন। একটা "জমিদারির সারবান লর্ডবাহাদুর।"[৩৩] বার্ষিক চারলক্ষ টাকার জমিদারি। জনসেবার কোন হিল্লে! আত্মীয়স্বজনরা জমিদারিতে চাকরী পেল। আত্মীয় সেবাও তো জনসেবার পর্যায়ে পড়ে। আর কিছু? লর্ডজ্যাকব (নামেরও পরিবর্তন ঘটেছিল) জনসেবা করলেনও খুব। গ্রামে নিজের নামে একটা হাইস্কুল, বাপের নামে একটা খয়রাতি দাওয়াখানা ও মায়ের নামে একটা জুনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপন করলেন। আর কিছু? চারলক্ষ টাকার জমিদারি থেকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন অনেক টাকা—বার্ষিক তিন শত একত্রিশ টাকা মাত্র! দেশে দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল।

স্পষ্টতই জনসেবা ইউনিভার্সিটি গল্পে লেখক জনসেবার নামে আত্মসেবাকারী বড়জোর আত্মীয় সেবাকারীদের ব্যঙ্গ করেছেন। সমাজ পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়ে ইয়াকুব মিয়া শুধু নিজের এবং কিছুটা আত্মীয়-

স্বজনের অবস্থার পরিবর্তন করেছিলেন। দানবীর ব'লে খ্যাত হলেন চারলক্ষ টাকার জমিদারি থেকে মাত্র তিনশত একত্রিশ টাকা দান করে। ইয়াকুবের মত আদর্শ থাকতে জনসেবার নামে আত্মসেবার এ' সহজ সুযোগ জনগণ কি হাতছাড়া করে? তার উত্তর চমৎকার আয়রনির মাধ্যমে দিয়েছেন লেখক— "ইয়াকুব সাহেবেরা আজো এদেশের সকল তরুণ বৃদ্ধের প্রাণে জনসেবার অনুপ্রেরণা জাগাচ্ছে। তাইনা এদেশে জনসেবকের এমন ভিড়!"৩৪

'জনসেবা ইউনিভার্সিটি'র মতই আরেকটি গল্প 'জমিদারি উচ্ছেদ'। এ' গল্পে জমিদারি উচেছ্দের ভাঁওতা দিয়ে গ্রামের সাধারণ ব্যক্তি মুন্‌শীজি আইন-সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল জমিদারি উচ্ছেদ না হলেও জমিদার উচ্ছেদ হয়েছে। দুঃখের বিষয়, নতুন জমিদার হয়েছিলেন স্বয়ং মুন্‌শীজি। ভাঁওতাবাজির এখানেই শেষ নয়—গ্রামের সাধারণ জনগণকে তিনি পুনর্বার বোঝালেন, তিনি জমিদার না হ'লে ভিন গাঁয়ের লোক জমিদার হতেন এবং খাজনার টাকা পয়সা ভিন গাঁয়ে চলে যেত। জনগণ তাকে পুনর্বার নির্বাচিত করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এ'গল্পেও নির্বাচনী ওয়াদাভঙ্গকারী ভণ্ড রাজনীতিকদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। পরিবর্তন নেতারা করেন বটে, তবে দেশের বা সমাজের নয় নিজের। "তিনি তহবন্দ পরে গিয়েছিলেন, শেরওয়ানী পরে ফিরে এলেন; পায়ে হেঁটে ষ্টেশনে গিয়েছিলেন, ঘোড়ার গাড়ী চড়ে ফিরে এলেন।"৩৫ তাছাড়া, মুন্‌শীজির মতো চরিত্ররা শুধু নির্বাচনী ওয়াদা ভঙ্গ ক'রে ক্ষান্ত হননা; নিরক্ষর জনগণের সাথে কি রকমের ভণ্ডামি করেন তাও এ' গল্পে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। 'আমি তোমাদের প্রতিনিধি। আমার জমিদারি দখল করা মানেই প্রজার জমিদারি দখল করা, এও এক রকম জমিদারি উচ্ছেদ বৈ কি' ?৩৬

রাজনীতি পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্প "এ. আই. সি. সি."। এ'গল্পে অজস্র দলবাজি–সমিতিবাজি থেকে শুরু ক'রে দেশসেবায় নিরপেক্ষতার অভাব, কৃত্রিম শোকসভার আয়োজন, জনগণকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে নেতাদের নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গল্পের সংক্ষিপ্ত কাহিনী নিম্নরূপ—শহীদ চাকরী না পেয়ে সহজতর পন্থা অর্থাৎ মন্ত্রীত্বলাভের দিকে অগ্রসর হল। কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম লীগের

শরাফতি অপছন্দের কারণে নিরপেক্ষ সংগঠনের উদ্যোগ নিল। কিন্তু যে নামেই সমিতি করতে চায়, সে নামেই সমিতি আছে। সে অল ইণ্ডিয়া কনডোলেন্স কংগ্রেস (এ. আই. সি. সি.) স্থাপন করল। উদ্দেশ্য—প্রয়াত নেতাদের জন্য যৌথভাবে অকৃত্রিম শোক প্রকাশ। শহীদ মারা যাবার আড়াইশত বছর পরের কথা। এক সভায় পঁচিশ সাল৷ রিপোর্টে জানানো হল—নেতারা কেউ মরছেনা ব'লে শোকসভা পালনে সমস্যা দেখা যাচ্ছে। নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করা হ'লে তারা মরতে নারায ব'লে জানালেন। তাদের যুক্তি—যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য মরে ; সেনাপতি মরে না ইত্যাদি ইত্যাদি। শোক প্রকাশের জন্য নেতা পাওয়া গেলনা বলে সভা স্থগিত ঘোষিত হল এবং মরবার জন্য নেতাদের অর্ধশতাব্দী সময় দেয়া হল।

আগেই বলা হয়েছে গল্পে সমিতিবাজিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। শহীদ পথে ঘাটে হাজার হাজার সমিতি দেখে অগত্যা দর্জি সমিতি গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে ভাবছিল। "সে হাফ-সার্ট কেনা ফেলিয়া কল্পিত দর্জি সমিতির কনস্টিটিউশন রচনার জন্য ফিরিয়া বাসায় ছুটিল। রাস্তার মোড় ঘুরিবার সময় হঠাৎ এক দোতালার রেলিং-এ প্রায় পনের হাত লম্বা সাইনবোর্ডে লেখা দেখিল 'নিখিল দর্জি সমিতি'।"[৩৭]

এ. আই. সি. সি.র অন্যতম উদ্দেশ্য একই সাথে ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যকর। "অনেক অর্থ বিত্তশালী লোকের আত্মীয়স্বজন নিজেদের পরলোকগত আত্মীয়ের নামে ঢাক-ঢোল পিটাইয়াবার উদ্দেশ্যে নিজেরাই অর্থব্যয় করিয়া কৃত্রিম শোক-সভার আয়োজন করে এবং তাতে প্রকৃত গুণী লোকের স্বার্থহানি হইয়া থাকে। এই সব অনাচার করাপশন ও এডালটেরেশন দূর করিবার জন্য সমিতি শোক প্রকাশের একমাত্র অধিকারীরূপে নিজেদের অধিকার পেটেন্ট রেজিষ্টারি করিবে।"[৩৮] যুদ্ধে সেনাপতি এগিয়ে আসেন না কেন? "যেহেতু তিনি আগাইয়া আসিয়া প্রাণত্যাগ করিলে যুদ্ধ থামিয়া যাইবে ; তাতে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মরিবার চান্স হইতে বঞ্চিত হইবে।"[৩৯]

এ. আই. সি. সি. গল্পে আসলে বর্তমান নেতৃত্বকে চূড়ান্তভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং গল্পকার বলতে চেয়েছেন যতদিন এ নেতৃত্ব থাকবে ততদিন জনগনের কপালে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই জুটবেনা। এদেশে এ. আই. সি.সি.র কোন স্বার্থকতা নেই ; কেননা বর্তমান নেতৃত্বের কোন মৃত্যু নেই।

নেতাদের রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে 'অ তে অজ-গর আসছে তেড়ে' স্টাইলে 'রচিত রাজনৈতিক বাল্যশিক্ষা' ও 'রাজনৈতিক ব্যকরণ' রচনা দুটিতে। নেতাদের রাজনৈতিক শিক্ষা কতদূর এবং কোন উদ্দেশ্যে ধাবিত দু'টি বা তিনটি উদ্ধৃতি থেকে সহজবোধ্য হবে।

> আ——আমদানী রফতানীর আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই যে, আমদানী মানে আমার পকেটে আমদানী; রফতানী মানে তোমার পকেট হইতে রফতানী।[৪০]

> দ——দল বা পার্টি মানে একই উদ্দেশ্যে কতিপয় লোকের একত্রিত হওয়া যথা জয়েন্টষ্টক কোম্পানী। ষ্টক যদি জয়েন্ট না থাকে, তবে দলত্যাগ করিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করিওনা।[৪১]

ওয়েনার দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে 'ইনটারেষ্ট গ্রুপ' এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। ওয়েনারের মন্তব্যের যাথার্থ্য সহজবোধ্য।

'রাজনৈতিক ব্যাকরণে' 'প্রচলিত বিভিন্ন টার্ম'-এর অভিনব সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন "অব্যয়——যে পদে কোনও ব্যয় হয়না, শুধু আয় হয়, তাকে অব্যয় বলা হয়। যে সব পদে বেতনের উপরি ড্রাইভার সহ গাড়ি, ক্রিকন্ডিশন্ড বাড়ী···ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে, যেখানে বেতনের টাকা ব্যয় করিবার কোনও রাস্তা নাই বলিয়া এই সব পদকে অব্যয় পদ বলা হয়।[৪২] এ 'ধরনের যুক্তিতে ফ্যালাসিপ্রসঙ্গ মনে আসতে পারে। আবুল মনসুর আহমদ বিভিন্ন রচনায় প্রচুর ফ্যালাসির ব্যবহার করেছেন ব্যঙ্গরস সৃষ্টির অন্যতম কৌশল হিসেবে। এ দেশের ফ্যালাসিতে ভরা রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করতে গেলে ফ্যালাসির ব্যবহার না ক'রে উপায়ই বা কি আছে। এ প্রসঙ্গে মনসুর-প্রদত্ত রাজনীতির সংজ্ঞা এবং রাজনীতি-সাহিত্য সম্পর্কে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মন্তব্য উদ্ধৃত হতে পারে: "মানুষ জাতি যে আচরণের দ্বারা রাজদরবারে নীত হয়, এবং তথায় গোপাল ভাঁড়ের মত সাফল্যের সাথে মনের ভাব গোপন রাখিয়া রাজা-প্রজা উভয়পক্ষকে ফাঁকি দিতে পারে তাকে রাজনীতি বলা হয়।'''এই লেখাটি আবুল মনসুর আহমদের রাজনীতি-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ফসল এবং অবশ্য পাঠযোগ্য।"[৪৩]

(ঘ) নির্বাচন প্রহসন ও ভোটরঙ্গ—রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ভোটপ্রসঙ্গ। ভোটের সাথে জড়িয়ে আছে নির্বাচনীওয়াদা, ওয়াদাভঙ্গ, ভোটক্রয়-বিক্রয়, নমিনেশন ক্রয়-বিক্রয়, দলত্যাগ, সম্ভাব্য বিজয়ীদলে যোগ-দান আরো কতকি। 'জন সেবা ইউনিভার্সিটি' ও 'জমিদারি উচ্ছেদ' গল্পে নির্বাচনী ওয়াদা-ভঙ্গের পরিচয় মিলেছিল। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে শুধু যে নির্বাচন প্রার্থীদের চরিত্র নেই, তা নয়, এক হিসেবে অধিকাংশ ভোটারেরও চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই। "Not only are the loyalties of leaders to parties weak in Pakistan ; it would seem that the voters' loyalties are weak too।"[৪৪] ওয়েনারের এ' মন্তব্য এ' অঞ্চল প্রসঙ্গে আগেও প্রযোজ্য ছিল, এখনো প্রযোজ্য। 'চেঞ্জ অব হার্ট,' 'বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে', 'ইলেকশন' প্রভৃতি গল্পের মাধ্যমে এ অঞ্চলের ভোট ব্যবস্থার অসুন্দর দিকগুলোকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। প্রথমেই 'চেঞ্জ অব হার্টে'র শুরুটা শোনা যাক, "আইন সভার নির্বাচনের মওসুম পড়িয়াছে। ক্যানডিডেটের ভিড় লাগিয়াছে। চাকুরিরা চাকুরী ছাড়িয়া, উকিল ওকালতি ছাড়িয়া, মাষ্টার মাষ্টারি ছাড়িয়া, দোকানদার ব্যবসায় ছাড়িয়া, পীরসাহেব পীরগিরি ছাড়িয়া, এমন কি মেয়েরা গিন্নীপনা ছাড়িয়া, আইনসভার মেম্বরির দরখাস্ত করিতেছেন।"[৪৫] তারপর যথারীতি দল-বদলের পালা এবং সম্ভাব্য বিজয়ী দলে যোগদান। 'চেঞ্জ অব হার্টে'র নযির মিয়া নির্বাচনী মওসুম শুরু হলে, চাকরী দূরে ঠেলে এককালীন শত্রুদল লীগের টিকেট চাইলেন; কেননা লীগের জেতার সম্ভাবনা বেশী অন্যান্য অনেক দলের চাইতে। লীগনেতাদের কাছে গিয়ে লীগ ম্যানিফেষ্টো সমর্থন এবং তার 'চেঞ্জ অব হার্টে'র কথা বললেন অর্থাৎ আগে লীগবিরোধী থাকলেও বর্তমানে তিনি লীগবিরোধী নন। লীগনেতারা নযির মিয়ার লীগ-ভক্তির কথা জানবার পর হঠাৎ জানালেন, নযির মিয়াকে নমিনেশন দেওয়া সম্ভব হবেনা। অবশ্যি নমিনেশন না দেওয়ার পেছনে নযির মিয়ার লীগ-ভক্তি যাচাই অথবা অন্য কোন কারণ নিহিত ছিল। নযির মিয়া অবাক হলেন এবং পুনর্বার লীগবিরোধী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ালেন। নির্বাচনে হারবার পর বিবি 'হায় হায়' করতে শুরু করলে নযির মিয়া জানালেন, "দেশের নেতাদের সত্যিকার 'চেঞ্জ অব হার্ট' হয়েছে কিনা তাই পরখ করবার জন্য তিনমাসের ছুটি নিয়েছিলাম মাত্র।"[৪৬]

আসলে নযির মিয়ার অথবা এ'দেশের অধিকাংশ নির্বাচন প্রার্থী অথবা নেতাদের 'চেঞ্জ অব হার্ট' হয়না। 'চেঞ্জ অব পার্টি' হয় মাত্র। নযির মিয়া মতবদল অথবা দলবদল করেছিলেন "লীগকে ভালবেসে নয়, আইন সভার সদস্য পদকে ভালবেসে—বাড়ী-গাড়ীর স্বপ্নকে ভালবেসে" আশা এবং আশাভঙ্গের কারণে। সেহেতু একাধিকবার তার 'চেঞ্জ অব হার্ট' হয়। যারা নমিনেশন দেয়ার অধিকারী, সে'সব নেতাদের আন্তরিকতা কতটুকু তাও বিবেচ্য। তাদের বক্তব্য, এলাকার লোকেরা যাকে চায়, তাকেই টিকিট দিলে ভোটারদের লীগ-প্রীতি ত টেষ্ট করা হলনা '''সেজন্য এলাকার লোকেরা চায়না এমন লোককেই আমরা লীগ টিকিট দিয়েছি, বুঝলেন।[৪৭] 'এলাকার লোকেরা চায়না এমন লোককেই' টিকেট দেয়া ইত্যাকার শব্দ-সমষ্টির আপাত-অর্থের পেছনে নমিনেশন দাতা নেতাদের চক্রান্ত ও স্বজনপ্রীতি বোঝা যায়।

'চেঞ্জ অব হার্ট' গল্পে ব্যঙ্গ করা হলো চেঞ্জ অব পার্টি অর্থাৎ দল-বদলকে আর 'বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে' গল্পে ব্যঙ্গ করা হয়েছে নমিনেশন ব্যবসাকে। টাকার জোরে নমিনেশন পাওয়া অথবা কেনা এবং টাকার বিনিময়ে নমিনেশন ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে 'বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে' গল্পে। মাহমুদ কর্পোরেশনের নমিনেশন পেয়ে টাকার বিনিময়ে এক চামড়ার সওদাগরের কাছে নমিনেশন বিক্রি করেছিলেন। লীগ-অফিস থেকে ফেরার পথে বন্ধুদের বক্তব্য "মাহমুদ নিয়ে বের হল টাকা; সদাগর সাব নিয়ে এলেন লীগের নমিনেশন; আর আমরা নিয়ে এলাম চরম বিস্ময়।"[৪৮] এ বিস্ময় হয়তোবা গল্প পাঠকেরও। কিন্তু এ' অঞ্চলের নমিনেশন ব্যবসার সাথে যারা পরিচিত তাদের জন্য বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।[৪৯] পার্টিকর্মী না হয়েও, টাকার জোরে অনেক সময় নমিনেশন কেনা যায় এদেশে এবং সংবাদপত্রে খবর বের হয় "প্রবীণ লীগ কর্মীর"[৫০] প্রার্থীপদ লাভের খবর।

"ইংরেজ আমলে যখন দেশীয় মন্ত্রীনিয়োগ ও আইন সভার নির্বাচন প্রবর্তন হয় তখন জনৈক অবসর প্রাপ্ত সরকারী আমলার নির্বাচনে অংশগ্রহণ, পরাজয় ও পুনরায় সরকারী চাকরীর তদ্বীর 'ইলেকশনে'র বিষয়। আমলা যে মূলতঃ জনসংযোগহীন, তার ক্ষমতা-জ্যোতি কেবল চেয়ার-বিচ্ছুরিত

এবং অবসর প্রাপ্তির পরইমাত্র সমাজে ও দেশে তার যথার্থ স্থান নির্ধারিত হয় 'ইলেকশন' গল্পে এ বক্তব্যও লেখক চমৎকারভাবে উত্থাপন করেছেন।"

(ঙ) বিদেশী শাসকপ্রীতি ও খেতাবের মোহ

বিদেশী শাসক অর্থাৎ ইংরেজপ্রীতি ও ইংরেজ-প্রদত্ত খেতাবের মোহকে আবুল মনসুর আহমদ বিভিন্ন গল্পে ব্যঙ্গ করেছেন। 'ইলেকশন' গল্পেও তার কিছুটা পরিচয় আছে। কিন্তু খেতাবের মোহ এবং খেতাব-ত্যাগের মর্মান্তিক যন্ত্রণা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'মডার্ণ ইবরাহিম' গল্পে। একই সাথে কমিক, ব্যঙ্গ ও হিউমারের সুনিপুণ ব্যবহার আবুল মনসুরের খুব বেশী গল্পে নেই। খান বাহাদুরের খেতাব ত্যাগের পর, তার বিভিন্ন কথা শুনে, খেতাবের দাফন দেখে এবং 'মাকবারা'র উপর মার্বেল পাথরের মন্তব্য প'ড়ে পাঠক হাসবেন, না কাঁদবেন, নাকি ঘৃণা প্রকাশ করবেন—বুঝে ওঠা মুশকিল। "কিন্তু জান বিবি, তোমাকে এ বয়সে হারালে আমার যে কষ্ট হবে, খেতাব ত্যাগের কষ্ট তার চেয়ে কম হচ্ছেনা। মমতাজকে হারিয়ে শাজাহানের কি ব্যথা হয়েছিল, আজ তা বুঝতে পারছি। আমি খেতাব ত্যাগ করব বটে, কিন্তু তার উপর আমি তাজমহল রচনা করব।"[৫১] যথাসময়ে খানবাহাদুর সাহেব তাঁর খেতাব ত্যাগের পত্র যেদিন লাটের কাছে পাঠালেন, সেদিন বাড়ীর সামনের বাগানের ঠিক মাঝ-খানে ধুমধামের সঙ্গে সোনালীফ্রেমে বাঁধা সনদটির দাফন করলেন এবং তার উপর একটি সুন্দর মাকবেরা তৈরী ক'রে তাতে মার্বেল পাথরে প্রথমে বাঙলায় ও পরে ইংরেজীতে লিখে রাখলেন—

পাকিস্তান জিহাদের প্রথম শহীদ
শায়িত হেথায়।[৫২]

খেতাব-ত্যাগের আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছিল, সে পরিপ্রেক্ষিতে 'মডার্ণ ইবরাহিম' গল্পটি লিখিত। রচনাকাল ১৯৪৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' পদবী পরিত্যাগ ক'রে একটি পত্রে তৎকালীন ভাইসরয়কে লিখেছিলেন :

"The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation.

and I, for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen, who for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings."৫৩

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুধাবন করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

তথ্যনির্দেশ

১ আবুল মনসুর আহমদ, 'আত্মকথা', পৃষ্ঠা ২৮৩-৮৮, নভেম্বর, ১৯৭৮, ঢাকা।

২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯

৩ মহিউদ্দীন আহমদ, প্রকাশকের নিবেদন, 'ফুডকনফারেন্স', ৩য় সংস্করণ, ১৩৭৮, ঢাকা।

৪ নজরুল ইসলাম, 'আয়নার ফ্রেম', আয়না, ১৯৭৮, ঢাকা।

৫ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, 'উদ্বোধনী', 'ফুডকনফারেন্স' পূর্বোক্ত।

৬ আবুল মনসুর আহমদ, 'আবুল কালাম শামসুদ্দীন করকমলেষু', 'আয়না' পূর্বোক্ত।

৭ 'ভাই আয়নুল হক খাঁকে', 'ফুডকনফারেন্স', পূর্বোক্ত।

৮ উৎসর্গপত্র, 'গালিভারের সফরনামা', ১৯৭৮, ঢাকা।

৯ আবুল কালাম আযাদ, 'India Wins Freedom', আনিসুজ্জামানের মুসলিম মানস ও বাঙলা সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১০২

They saw that the British Government was using the Muslims against India's political struggle and the Muslims were playing the government's game."

১০ বদরুদ্দীন উমর "ভারতবর্ষে বৃটিশের ক্ষমতা দখল ও হস্তান্তর" 'সাম্প্রদায়িকতা', ১৩৭৭, পৃ. ৮০, ঢাকা।

১১ আবুল মনসুর আহমদ, "অথ কুত্তা-শিয়াল-চরিতামৃত" (গালিভারের সফরনামা), পৃ. ১৫৯-৬০

১২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

১৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

১৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

১৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

১৯ আবুল মনসুর আহমদ, "হুজুর কেবলা", "আসমানীপর্দা", পৃ. ১৩৬

২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

২২ আবুল মনসুর আহমদ, "ত্রিগুণমিতি" (আসমানীপর্দা), পৃ. ৯১

২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

২৬ আবুল মনসুর আহমদ, "ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি" (আসমানী পর্দা), পৃ. ১২৮

২৭ আবুল মনসুর আহমদ, "বিদ্রোহী সঙ্ঘ" (আয়না), পৃ. ১৩১

২৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

২৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

৩০ Myron Weiner, The politics of South Asia in the politics of the Developing areas Almond and Coleman edited, 1970, p. 185

৩১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩

৩২ আবুল মনসুর আহমদ, "জনসেবা ইউনিভার্সিটি" (ফুডকনফারেন্স), পৃ. ১৪১

৩৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

৩৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬

৩৫ আবুল মনসুর আহমদ, "জমিদারি উচ্ছেদ" (ফুড কনফারেন্স), পৃ. ১২৮

৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

৩৭ আবুল মনসুর আহমদ, 'এ. আই. সি. সি.' (ফুডকনফারেন্স) পৃ. ৪২

৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৩৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

৪০ আবুল মনসুর আহমদ "রাজনৈতিক বাল্যশিক্ষা" (গালিভরের সফরনামা), পৃ. ১৪০

৪১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

৪২ আবুল মনসুর আহমদ, ''রাজনৈতিক ব্যাকরণ'' (গালিভরের সফরনামা) পৃ. ১৪৮

৪৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে'. 'আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে' পৃ. ৮৪

৪৪ ওয়েনার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

৪৫ আবুল মনসুর আহমদ, ''চেঞ্জ অব হার্ট'' (গালিভরের সফরনামা) পৃ. ৯

৪৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

৪৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪

৪৮ আবুল মনসুর আহমদ, ''বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে'' (গালিভরের সফর-নামা), পৃ. ৬৬

৪৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

৫০ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে' (আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে, ১৯৮১) পৃ. ৪৩

৫১ আবুল মনসুর আহমদ, 'ইলেকশন' (গালিভরের সফরনামা), পৃ. ১৩৯

৫২ আবুল মনসুর আহমদ, 'মডার্ণ ইব্রাহিম' (গালিভরের সফরনামা), পৃ. ১১৮

৫৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান কৃত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', উদ্ধৃত, পৃ. ৪১০, প্রথম সং, ঢাকা।